ক্রান্তিকালের বাজেটঃ প্রত্যাশা বনাম প্রাপ্তি

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

এবারের বাজেট নিয়ে বিভিন্ন মহলের প্রত্যাশা ও কৌতুহল ছিল আগেকার যে কোন বাজেট থেকে অনেকগুণ বেশী। বস্তুতঃ গত প্রায় অর্ধযুগ ধরে মিডিয়া, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ইত্যাদির সম্মিলিত প্রচারণায় একটি আদর্শ সরকারের যে চিত্রটি বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসে অঙ্কন করা হয়েছিল, সে ধরণেরই একটি সরকার বর্তমানে দেশ চালাচ্ছে। সরকারের নীতি নির্ধারকদের রাজনৈতিক অভিলাস নেই, তাই রাজনৈতিক পক্ষপাতের কারণে রাষ্ট্রের অর্থের অপব্যবহারের সম্ভাবনা নেই। ফলে প্রত্যাশা ছিল যে, এ সরকার এমন একটি ব্যতিক্রমী বাজেট জাতিকে উপহার দিবে যাতে থাকবে বাংলাদেশের অর্থনীতির খোল-নলচে বদলে দিয়ে দেশকে দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা। প্রস্তাবিত বাজেট সে প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে এবং তাতে বাংলাদেশের দ্রুত সমৃদ্ধির কি কি উপকরণ রয়েছে তা বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা করা হলো।

বাজেটের সামগ্রিক পর্যালোচনা করার আগে দেখা যাক, বাজেটের কোন কোন দিক অর্থনীতিকে কি কি ভাবে প্রভাবিত করে এবং ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের গতানুতিকতাকে অতিক্রম করে অর্থনীতির খোল-নলচে বদলে দিতে বাজেটে কি ব্যবস্থা রাখা যায়। তারপর আমরা দেখবো প্রস্তাবিত বাজেটে এ ধরণের যুগান্তকারী বাজেটের কোন উপাদান কতটুকু রয়েছে।

বাজেটের মূল দুটি অংশ - একটি হচ্ছে কত টাকা কোথায় খরচ করা হবে তার পরিকল্পনা এবং অপরটি হচ্ছে সে টাকা কোথা থেকে আসবে তার হিসাব। বাংলাদেশে বাজেট তৈরীর দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ অর্থের উৎস খোঁজার ব্যাপারে সরকারের উচ্চ মহল থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই আগ্রহ থাকে তুলনামূলক অনেক বেশী। আমাদের বাজেটের অর্থায়নের প্রধান উৎস হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের কর ও শুল্ক যা সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবি সকলের জীবনযাত্রার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। কোন পণ্যের শুল্কের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে তার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদনে শুল্ক কাঠামো প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। যখন কোন পণ্যের কাঁচামালের শুল্ক এমন পরিমাণ ধরা হয় যার ফলে উক্ত পণ্যটি প্রস্তুতকৃত অবস্থায় আমাদানী করতে যে খরচ পড়ে তার থেকে কাঁচামাল আমদানী করার পর দেশে উৎপন্ন করতে খরচ বেশী পড়ে যায় তখন সে পণ্য উৎপাদনে কারো উৎসাহ তাকে না। আবার আয়কর সংক্রান্ত বিধি বিধান দুর্নীতির বিস্তার বা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। যেমন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রবর্তিত কালো টাকা সাদা করার বিধান বিগত সরকার অব্যাহত রেখেছিল যাতে কালো টাকার মালিকেরা অনেক কম কর দিয়ে বৈধ সম্পদের মালিক হতে পারতো। এ সকল বিধান দুর্নীতিকে যে কতটা উৎসাহিত ও দুর্নীতিবাজদেরকে কতটা বেপরোয়া করে তুলেছিল, তা বর্তমানের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের মাধ্যমে আটককৃত শীর্ষ রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু শুল্ক ও করের প্রভাব নিয়ন্ত্রকের, চালকের নয়। শুল্ক ও করের হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টে দেয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে বাজেটের প্রথম অংশ, অর্থাৎ কোথায় কত খরচ করা হবে, সে বিষয়টি। তবে সরকারের বাজেট জিডিপির মাত্র ১৪.৩ শতাংশ। অর্থাৎ, দেশের জনগণ ও সরকার মিলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করে থাকে, সরকার করে থাকে তার শতকরা ১৪.৩ শতাংশ। ফলে বাজেট সরাসরি বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন আনতে পারে না।

দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন আনতে হলে তা অবশ্যই জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে হতে হবে। বাংলাদেশের সম্পদ ও সমস্যা সবই তার জনগণ। শুধুমাত্র জনগণ দিয়েই যে পৃথিবীর সবথেকে উন্নত দেশগুলির একটিতে পরিণত হওয়া যায় এবং মাটির নীচে ও উপরে অঢেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জনগণের কারেণই দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না তা জাপান এবং নাইজেরিয়াকে পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যায়। পৃথিবীর সবথেকে উন্নত দেশগুলোর একটি হচ্ছে জাপান। দেশটির আয়তন ৩৭৭,৮৩৫ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ১২ কোটি ৭৫ লক্ষ। দেশটির অধিকাংশ স্থান পাহাড়ী। মানুষের বসতি সীমিত আয়াতনের সমভূমিতে। বাসযোগ্য ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশী হবার কারণে দেশটি পৃথিবীর সবথেকে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে অনেকেরই মনে হবে, দেশটি হয়তো প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাপানের কোন খনিজ সম্পদ নেই। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে রয়েছে কিছু সামুদ্রিক মাছ। প্রকৃতি দেশটিকে সম্পদ না দিলেও দুর্যোগ দিতে কার্পণ্য করেনি। ভূমিকম্প, সুনামী, টাইফুন, অগ্নিগিরির অগ্নুৎপাত ইত্যাদির কোনটিরই কমতি নেই জাপানের। অপরদিকে নাইজেরিয়া পৃথিবীর সবথেকে দরিদ্র দেশগুলির একটি। দেশটির আয়তন ৯২৩,৭৬৮ বর্গ কিলোমিটার, জাপানের প্রায় তিনগুণ। জনসংখ্যা ১৩ কোটি ১৮ লক্ষ, জাপানের থেকে কিছু বেশী। নাইজেরিয়া পৃথিবীর সবথেকে তেল সমৃদ্ধ কয়েকটি দেশের একটি। তাছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাস, টিন, লোহা, কয়লা, লাইমস্টোন, নিওবিয়াম, শীশা, দস্তা ছাড়াও রয়েছে বিশাল উর্বর জমি। এই খনিজ সমৃদ্ধ দেশটি পৃথিবীর দরিদ্র ও পশ্চাতপদ দেশগুলির শীর্ষে রয়েছে। দেশটির শতকরা ৬০ ভাগ জনগোষ্ঠী দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। শতকরা ছয়ভাগ জনগণ এইডসে আক্রান্তআর শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ৯৮ জন (জাপানে এ হার হাজারে ৩ জন)।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যাকে কি আসলেই জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যাবে, গেলে কিভাবে এবং সেক্ষেত্রে সরকারের বাজেট কি ভূমিকা রাখতে পারে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য একটি তত্বীয় পরীক্ষা করা যাকে। যদি ঘোষণা করা হয়, স্নাতোকোত্তীর্ণ যে কোন তরুণ-তরুণীকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রত্যেককে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি সরকারী চাকুরী দেয়া হবে তাহলে কতজন এর জন্য আবেদন করবে? কমপক্ষে দশ লক্ষ। এর অর্থ হচ্ছে কমপক্ষে দশ লক্ষ বেকার শিক্ষিত তরুণ-তরুণী রয়েছে যারা তাদের কর্মসংস্থানের জন্য জনপ্রতি এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে সমর্থ ও প্রস্তুত। অর্থাৎ কোন প্রকার সরকারী বরাদ্দ, বিদেশী ঋণ কিংবা আন্তর্জাতিক ধনীদের বিনিয়োগ, যাকে অনেকে শ্রমশোষণ হিসাবে অভিহিত করে থাকেন, তা ছাড়াই দশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। এই দশ লক্ষ তরুণ-তরুণী তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের বিভিন্ন ধরণের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড যেমন মাছের পুকুর, মুরগীর খামার, দুধের খামার, গরু মোটাতাজাকরণ, হাস-মুরগীর খামার, ফল চাষ, রেশম চাষ ইত্যাদিতে নিয়োজিত হতে পারে। আবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের বিভিন্ন শিল্পও তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এখন তো ফার্নিচার তৈরী করেও লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করা যায়। এই বিনিয়োগের ফলে শুধু উক্ত দশ লক্ষ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানই যে হবে তা নয়, বরং তাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে আরও কয়েকগুণ (ষাট-সত্তর লক্ষ) মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এই বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার কারণে যে অর্থপ্রবাহ দেখা দিবে তার কারণে আরও অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এতো গেলো শিক্ষাগত, শারীরিক ও আর্থিকভাবে সমর্থ কিন্তু কর্মহীন নাগরিকদের মাত্র একটি অংশের কথা। জনগণের একটি বিশাল অংশ রয়েছে যারা ৫-১০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে। আবার ১০-২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে এ ধরণের শিক্ষিত তরুণদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। দেখা যাচ্ছে খুব সহজেই এক কোটি অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। এক কোটি মানুষের প্রত্যেকে গড়ে মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করলে বাংলাদেশের জিডিপিতে যুক্ত হবে অতিরিক্ত এক লক্ষ কোটি টাকা।

ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬-৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাড়াবে ২০ শতাংশেরও বেশীতে। অর্থাৎ, আমাদের নাগরিকদের যে ধরণের আর্থিক ও শিক্ষাগত সঙ্গতি রয়েছে তা দিয়েই জিডিপি ২০% শতাংশ বৃদ্ধি করা যায়। এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটলে শুধু যে দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করবে, তাই নয়, বরং দ্রব্যমূল্য নিয়ে যে দুর্ভোগ, তাও আর থাকবে না, কেননা, যে সকল পণ্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বাইরে তার মধ্যে জ্বালানী তেল ছাড়া প্রায় সবগুলোই কৃষিজাত পণ্য এবং সয়াবিন তেল ছাড়া বাকী সবগুলোই দেশে উৎপাদন করা সম্ভব।

এখন দেখা যাক, এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটাতে বাজেটে কি থাকা দরকার এবং তা প্রস্তাবিত বাজেটে রয়েছে কিনা। উপরে আমরা যে রূপকল্পটি একেছিলাম, তাতে দেখা যায়, জনগণের হাতে বিনিয়োগের মত পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে। এমন কি উদ্যোক্তা হবার মত উচ্চ শিক্ষাও তাদের রয়েছে। অভাব শুধু মানসিকতার এবং কারিগিরি জ্ঞানের। আমরা লেখাপড়া শিখি এই ধারণা নিয়ে যে শিক্ষা জীবন শেষে একটি সার্টিফিকেট পাবো যা দেখালে একটি চাকুরী পাওয়া যাবে। এর বাইরে গিয়ে নিজে কিছু করার চিন্তা আমাদের দেশের খুব কম তরুণ-তরুণী করতে পারে। তাছাড়া উদ্যোক্তা হবার জন্য যে ধরণের কারিগরি ও ব্যবসায়িক জ্ঞান প্রয়োজন, তাও আমাদের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের থাকে না। তবে, উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রধান বাধাটি মূলতঃ সামাজিক ও মানসিক। একে ভাঙতে সরকারকে অণুঘটকের ভূমিকায় বড়-সড় উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, ঠিক যেভাবে পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। দশ লক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার একটি বড় প্রকল্প নিতে পারে। তার অধীনে একদিকে যেমন উৎপাদনমুখী আত্ম কর্মসংস্থানের দিকে শিক্ষিত তরুণদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, তেমনি তাদেরকে উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞানও দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্যোক্তা মেলার আয়োজন করা যেতে পারে। সে সকল মেলায় তাদেরকে দেখাতে হবে কত সহজে তারা চাকূরে থেকে মালিক হতে পারে। কোন ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়তে কত অর্থ ও কি ধরেণের কাঁচামাল প্রয়োজন, সেগুলি কোথায় পাওয়া যাবে, যন্ত্রপাতি লাগলে তার মূল্য কত ও কোথায় পাওয়া যায়, সেগুলি চালাতে কেমন ধরণের অপারেটার প্রয়োজন, সে উদ্যোগ থেকে কেমন লাভ হবে ইত্যাদি বিষয় সেখানে প্রদর্শন করা হবে। দুঃখের বিষয় প্রস্তাবিত বাজেটে এ ধরণের কিছুই নেই। শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী বাজেটের তুলনায় এ বাজেট কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে অনেকটা উদাসীন। বাংলাদেশী তরুণদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর্ম সংস্থানের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। তাদের পাঠানো রেমিটেন্সের কথা অর্থ উপদেষ্টা গর্বভরে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের জন্য বাজেটে কি রয়েছে তা বলেন নি। বিগত সরকারের আমলে বিদেশগামী তরুণ-তরুণীদের ভাষা শিক্ষা, বিভিন্ন ধরণের কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদির কথা বলা হতো। এবার সে বিষয়েও কোন কিছু শোনা যাচ্ছে না। যারা বাজেট প্রণেতাদের নিকট থেকে সব কিছু বদলে দেবার মত দেশপ্রেম, দূরদৃষ্টি আর স্বপ্ন প্রত্যাশা করেছিলেন, তারা সকলেই হতাশ হয়েছেন। এ কারণেই হয়তো সরকারের ঘোর সমর্থক অর্থনীতিবিদগণও এ বাজেটকে হতাশভাবে গতানুগতিক আখ্যা দিয়েছেন।

আশাভঙ্গের এই প্রাথমিক ধাক্কা সামলানোর পর দেখা যাক গতানুগতিকতার মানদন্ডে এ বাজেটের স্থান কোথায়। অর্থ উপদেষ্টা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন মহলের প্রস্তাব বিবেচনা করে, পূর্ববর্তী বাজেট সমূহের সমালোচিত দিকগুলো রহিত করে এদিকে ওদিকে কিছু সংস্কার ও উন্নয়ন করতে। কৃষি গবেষণা খাতে ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে। মংলা বন্দরের গুরুত্বের কথা বাজেট বক্তৃতায় এসেছে এবং অর্থ উপদেষ্টা বলেছেন যে বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত সমীক্ষান্তে সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নয়ো হবে। বন্দরটিকে পুনরায় সচল করা গেলে দেশের আমদানী-রফতানীতে তা যেমন ভূমিকা রাখবে, তেমনি খুলনা

এলাকার অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কিছুটা হলেও উপশম হবে। তবে, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তিনি তুলে ধরতে পারলে ভালো হতো। এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন বৈষম্যের বিষয়টি বেশ কয়েক বছর ধরে আলোচিত হয়ে আসছিল। এবারের বাজেটে বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে তা দূর করার জন্য প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের জন্য অধিক বরাদ্দ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ধরণের একটি উদ্যোগের জন্য সরকার প্রশংসার দাবীদার। তবে এ ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট কোন তথ্য পেশ করা হয় নি। আমরা জানি না, কোন এলাকার জন্য কত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। নার্সিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারী খাতে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ দেয়ার উদ্যোগটিও প্রশংসনীয়। অধিক সংখ্যক দক্ষ নার্স শুধু যে দেশের স্বাস্থ্যসেবাকে উন্নত করতে ভূমিকা রাখবে তা নয়, বরং বিদেশেও এ পেশার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। প্রকৃত কৃষকদের জন্য ডিজেলে ভর্তুকী দেয়ার সিদ্ধান্ত জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে কৃষককে সহায়তা করবে। তবে ফিনিসড পণ্যে শুল্ক কমিয়ে শিল্পের কাঁচামালে শুল্ক বৃদ্ধি শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। অর্থ উপদেষ্টা দুর্নীতি দমনে তাঁর সরকারের উদ্যোগ ও সফলাতার কথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার বলেছেন। অথচ, দুর্নীতি দমন কমিশনকে জনবল বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও তথ্য-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করার মাধ্যমে শক্তিশালী করার কোন উদ্যোগের কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। উপরন্ত, ২০০৬-০৭ এর মূল বাজেটের তুলনায় কমিশনের বরাদ্দ প্রস্তাবিত বাজেট কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি দুর্নীতি দমনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সরকারের আন্তরিকতাকে প্রশ্ন বিদ্ধ করেছে।

তবে, সব থেকে বেশী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে বাজেটের আকার ও তার অর্থায়নের প্রস্তাবিত পন্থা। গত বছরের ৬৬,৭৩৬ কোটি টাকার বাজেট এবারে হয়ে গেছে ৮৭,১৩৭ কোটি টাকা। এক লাফে শতকরা ৩০ ভাগ বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাব নজীরবিহীন। গত কয়েক বছর নির্বাচনী বাজেট হওয়া সত্তেও এ বৃদ্ধি ছিল শতকরা ১৪ ভাগ, তার আগের বছর ২০০৫-০৬ এও শতকরা ১৪ ভাগই ছিল। উন্নয়ন বাজেট ও রাজস্ব বাজেট থেকে উন্নয়ন কর্মসূচি মিলে মোট উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮,৫২২ কোটি টাকা যা ২০০৬-০৭ এর সংশোধিত বাজেট থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বেশী। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে আমাদের উন্নয়ন ব্যয়ের অর্ধেকের মত দুর্নীতিতে অপচয় হয়। তার অর্থ হচ্ছে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে প্রকৃত উন্নয়ন ব্যয় হয়েছে ১২,০০০ কোটি টাকার মত। উন্নয়ন ব্যয়ের চাহিদা ২০ শতাংশ বাড়লেও তা দাড়ায় ১৪,৪০০ কোটি টাকায়। তাহলে আপাদ মস্তক ঋণে ডুবে ২৮,৫২২ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট কেন নেয়া হলো? এই বিশাল আকারের বাজেটের অর্থ যোগান দিতে গিয়ে সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ বহুলাংশে বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। যেখানে ২০০৬-০৭ সালের মূল বাজেটে এ ধরণের ঋণের পরিমাণ ছিল ৮,৮৩৪ কোটি টাকা যা বাস্তবে বেড়ে সংশোধিত বাজেটে দাড়ায় ১০,০৩১ কোটি টাকা, এ বাজেটে বাড়িয়ে একলাফে প্রস্তাব করা হয়েছে ১৯,২৭৬ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নেয়া ঋণের সুদের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী এবং তা তুলনামূলক স্বল্প মেয়াদে পরিশোধ করতে হয়। যেমন জনগণের নিকট সঞ্চয়পত্র বিক্রয় করে সরকার জনগণ থেকে ঋণ নেয়। সে ঋণ সুদ সহ চাহিবামাত্র আবার জনগণকে ফেরত দিতে হয়। জনগণের অর্থ যখন সরকার ঋণ হিসাবে নেয়, তা ব্যাংকিং খাত থেকে হোক আর বন্ড, সঞ্চয়পত্র - ইত্যাদি বিক্রি করে হোক, তখন জনগণের জন্য অর্থ প্রবাহ কমে যায় যার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সরকারই যদি সব টাকা নিয়ে নেয় তাহলে জনগণ ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদনে টাকা কোথায় পাবে? সে দিকেই জাতিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রস্তাবিত বাজেট। অপরদিকে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান নির্ভরতার ক্ষেত্রে বর্তমান বাজেট উল্টো পথে যাত্রা শুরু করেছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর ঋণের সুদের হার কম বটে, কিন্তু তাতে কঠিন শর্ত থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হানাহানি ও যুদ্ধ বাধিয়ে বেড়াচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র, তার প্রেসিডেন্ট বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে সরাসরি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। দেশটির দূতাবাসের সাথে মিলে উক্ত সংস্থাটি বিভিন্ন

দেশের অর্থনৈতিক মেরুদেন্ড ভেঙ্গে দেবার জন্য কাজ করে বলে বহু অভিযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজিয়ে তাদের শর্ত মেনে নেবার পরও চুক্তিমত ঋণের টাকা ছাড় না করে সংস্থাটি বাংলাদেশকে বহুবার বিপাকে ফেলেছে। যেখানে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক ঋণের উপর থেকে নির্ভরতা কাটিয়ে উঠছিল, বর্তমান বাজেটে তা আবার বাড়ানো হয়েছে। ২০০৫-০৬ এর বাজেটে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান ধরা হয়েছিল ১৩,৩৫১ কোটি টাকা যা ২০০৬-০৭ এ কমিয়ে করা হয় ১২,১২৬ কোটি টাকা। কিন্তু এবারে ২০০৭-০৮ এর বাজেটে তা ধরা হয়েছে ১৪,৬৫৮। বর্তমান সরকার এমনিতেই রাজনৈতিক কারণে অতিমাত্রায় বিদেশ নির্ভরতায় ভুগছে। টাকার জন্য তা আরও বেড়ে গেলে জাতীর জন্য তা মহা দুর্যোগ বয়ে আনতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সরকার যদি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ না নেয়, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ না বাড়ায়, তাহলে খরচ চালাবে কি দিয়ে? এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর রয়েছে। প্রথমতঃ সারা পৃথিবীতে এখন সরকারের আয়তন ছোট করা হচ্ছে, আমরা চলেছি তা উল্টো পথে। সরকারের আয়তন কমিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পূর্বেকার বাজেটগুলোতে যদি রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রচূরসংখ্যক প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে, এবং উন্নয়ন বাজেটের অর্ধেক যদি অপচয় হয়ে থাকে, তাহলে গত বছরের উন্নয়ন বাজেটের ৬০% অর্থ দিয়ে এবারের উন্নয়ন বাজেট বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারা উচিৎ। তৃতীয়তঃ কর ফাঁকিরোধ করে কর আদায় বাড়াতে হবে। চতুর্থতঃ জাকাতের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করে প্রত্যক্ষ দারিদ্র বিমোচনমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে বাংলাদেশে বছরে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশী যাকাত দেয়া হয়। এই বিপুল অর্থ বাজেট ঘাটতি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

বাংলাদেশ বর্তমানে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। প্রত্যেক সংস্কারের কিছু পাশ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকে যা প্রধানতঃ অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। এ রকম একটি ঝুকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে এ ধরণের একটি বিশালাকার ও ঘাটতি বাজেট দিয়ে অর্থ উপদেষ্টা দেশকে কোন দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছেন তা বোধগম্য নয়।